নির্বাচনী ট্রেনের যাত্রা শুরু

তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ট্রেন। তবে সেই ট্রেনে কারা কারা উঠবেন তা এখন নিশ্চিত নয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল তফসিল ঘোষণার পর এখন পর্যন্ত নিবন্ধিত দলগুলোর মধ্যে ১৫টি একে স্বাগত জানিয়েছে, ১৭টি দল প্রত্যাখ্যান করেছে। ১২টি দল এখনো নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি।

আমার ধারণা, সময়ের সাথে সাথে আরও অনেকগুলো দল নির্বাচনী ট্রেনে চড়তে মরিয়া চেষ্টা চালাবে। অঙ্কের হিসাবে যাই হোক, মূল কথা হলো ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর। তারা ইতিমধ্যে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রির মাধ্যমে নির্বাচনী লড়াইয়ে শামিল হয়েছে। তবে মাঠের মূল বিরোধী দল বিএনপি এখনো সরকার পতনের একদফা আন্দোলনে আছে। তারা নির্বাচনের তফসিল প্রত্যাখ্যান করেছে।

নির্বাচন কমিশনের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে যদি বিবেচনা করেন, নির্ধারিত সময়ে তফসিল ঘোষণা করা ছাড়া তাদের করার কিছু নেই। এটা তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। একদম যদি আইনের কথা বলেন, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্ধারিত সময়ে তফসিল ঘোষণা করে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করা। কারা নির্বাচনে আসবে, কারা আসবে না; এটা দেখা তাদের দায়িত্ব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য চেষ্টা নির্বাচন কমিশন কম করেনি।

তবে নির্বাচন কমিশন বারবার আমন্ত্রণ জানালেও বিএনপি তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে কি না, সবগুলো দল তাতে অংশ নেবে কি না, তা নিশ্চিত করা আসলে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব। তারা নিজেরা আলাপ-আলোচনা করেই তবেই ঠিক করবে। নির্বাচন কমিশন তো কোনো রাজনীতির অংশ নয়। কাউকে জোর করে নির্বাচনে আনা বা কাউকে নির্বাচনের বাইরে রাখা তাদের কাজ নয়।

সবচেয়ে ভালো হতো, তফসিল ঘোষণার আগেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার পরিবেশ তৈরি হলে। কিন্তু অনেকদিন ধরেই আমাদের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল নিজ নিজ অবস্থানে অনড়। আওয়ামী লীগ সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করতে চায়। আর বিএনপির একদফা

হলো, সরকারের পদত্যাগ। তো সরকার যদি পদত্যাগই করে তাহলে বিএনপি কার সাথে আলোচনা করবে? দুই পক্ষের শর্তের বেড়াজালে আটকে ছিল সংলাপের সম্ভাবনা।

তফসিল ঘোষণার আগে আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শর্তহীন সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়ে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশের প্রধান তিন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ জানিয়ে দিয়েছে, এখন আর সংলাপের সময় ও পরিবেশ নেই।

তাদের যুক্তি হলো, বিএনপি যেহেতু সরকার পতনের একদফা দাবিতে অগ্নিসন্ত্রাস চালাচ্ছে, তাই সংলাপের পরিবেশ তারাই নষ্ট করেছে। আর তফসিল ঘোষণার পর এখন আর সংলাপের সময় নেই। আওয়ামী লীগের যুক্তি মেনেও বলি, তারা যেহেতু টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় আছে তাই তাদের দায়িত্ব বেশি। একটু ছাড় দিয়ে হলেও বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে পারলে তা দেশ, জনগণ ও গণতন্ত্রের জন্য মঙ্গলজনক।

তফসিল ঘোষণা হলেও সব সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। এখনো আলোচনার সুযোগ আছে। প্রয়োজনে তফসিল পেছানোর সুযোগও আছে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সবাই যদি নিজেদের ইগো দূরে রেখে, শর্ত ভুলে গিয়ে সমঝোতার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসেন; এখনো একটি সুন্দর, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে জাতি। তাতে এক নিমেষে উড়ে যাবে শঙ্কার সব কালো মেঘ।

বিএনপি টানা ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু বিএনপি কোনো বিপ্লবী দল নয়। তারা একটি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক দল। ২০১৪ সালের নির্বাচনে তারা অংশ নেয়নি। ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিলেও ফলাফল হয়েছে শোচনীয়। বিএনপি চেষ্টা করেও ২০১৪ সালে নির্বাচন প্রতিহত করতে পারেনি।

২০১৮ সালের নির্বাচনের পরও কোনো প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। এখন তারা সরকার পতনের একদফা আন্দোলনে মাঠে আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার মতো কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি। নিকট ভবিষ্যতে পারবে, তেমন কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।
বিএনপি এখন আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করে, কিছু যানবাহনে আগুন দিয়ে, জনগণকে জিম্মি করে দাবি আদায় করা যাবে না। তাহলে বিএনপি কী করবে? আরও এক মেয়াদ ক্ষমতা বা ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে থাকার মতো সাংগঠনিক সক্ষমতা কি বিএনপির আছে।

আগেই বলেছি, বিএনপি কোনো বিপ্লবী দল নয়। তারা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া একটি দল। এবার নির্বাচনে গেলেই যে বিএনপি ক্ষমতায় চলে যাবে তেমন কোনো গ্যারান্টি নেই। তবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিলে নেতাকর্মীরা চাঙা থাকেন। ক্ষমতায় যেতে পারলে ভালো, না গেলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে জিততে পারলে সংসদের ভেতরে-বাইরে আন্দোলন চালানো যায়।

দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, এটা প্রমাণের জন্য বারবার নির্বাচন বর্জন করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় থাকার সুযোগ করে দিলে তো দিনশেষে বিএনপির ক্ষতি, আওয়ামী লীগেরই লাভ। আওয়ামী লীগ অনেক আগে থেকেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে। তারা দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি করাও শুরু করেছে। এতদিন আওয়ামী লীগ প্রস্তুতি নিয়েছে বিএনপি নির্বাচনে আসবে ধরে নিয়েই।

আওয়ামী লীগের দুই ধরনের প্রস্তুতিই আছে। বিএনপি নির্বাচনে এলে জাতীয় পার্টিসহ মহাজোট হিসেবে আওয়ামী লীগ তাদের মোকাবিলায় মাঠে নামবে। আর না হয় হয়তো জাতীয় পার্টি আলাদাভাবেই নির্বাচন করবে, যাতে মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আগেই তৃণমূল বিএনপিকে তৈরি করে রেখেছে সরকার।

আর নির্বাচন এলেই বাংলাদেশের কিছু ইসলামি দল মাঠে নামে নানা সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার ধান্ধায়। তারা কখনো এই দলের সাথে, কখনো ঐ দলের সাথে দর কষাকষি করে। ভোটের মাঠে তাদের অবস্থান নড়বড়ে হলেও আওয়াজ তাদের অনেক লম্বা।

তবে বছরের পর বছর বাংলাদেশের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে, ধর্ম নিয়ে তাদের আবেগ থাকলেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তাই তো এই দেশেও ইসলামি দলগুলোর ভোট ভগ্নাংশের বেশি নয়। বিএনপি যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে নাই আসে, তাহলে কি নির্বাচনের ট্রেন থেমে থাকবে? নির্বাচনের পরে কী হবে, যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে জানি না; তবে নির্বাচনের ট্রেনের যাত্রা থামার কোনো সুযোগ নেই। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার স্বার্থেই এই ট্রেন এগিয়ে যাবে।

লেখক: বার্তা প্রধান, এটিএন নিউজ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তফসিল ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৪ সালের ২৯শে জানুয়ারি। সংবিধান অনুযায়ী সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত ৯০ দিনের মধ্যে একটি তারিখ নির্ধারণ করে ও নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ারলী যুক্ত করে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়। এহেন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন গত ১৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন এবং নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা নিশ্চিত করা আছে। এ অনুচ্ছেদ মতে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় অভিযোগ করে যে নির্বাচন কমিশন সরকারের ‘আজ্ঞাবহ’ থাকে, আর ক্ষমতাসীন সরকার সবসময় নির্বাচন কমিশন স্বাধীন বলে দাবি করে।

তফসিল ঘোষণার পর আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন চাইলে প্রশাসনের মধ্যে রদবদল করতে পারে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বলা হয়েছে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে বিভাগীয় কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং তাদের অধস্তন কর্মকর্তাদের নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনা ছাড়া বদলি করা যাবে না।

অন্যদিকে নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বদলি করার প্রয়োজন হলে নির্বাচন কমিশন লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবে। এরপর যত দ্রুত সম্ভব সে বদলি

কার্যকর করতে হবে। যদি কোন প্রার্থী নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধির গুরুতর লঙ্ঘন করেন, সেক্ষেত্রে প্রার্থিতা বাতিল করতে পারে নির্বাচন কমিশন। এ বিষয়টিতে নির্বাচন কমিশনের পুরোপরি এখতিয়ার আছে। বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে উল্লেখ করা আছে, একজন রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচন কমিশন যেভাবে দায়িত্ব দেবে, তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন। একজন রিটার্নিং অফিসার একটি এলাকায় ‘অল ইন অল’ বা সর্বেসর্বা। তার তত্ত্বাবধানের নির্বাচন পরিচালিত হয়। রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ও বাতিল করা নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার। নির্বাচনী কার্যক্রম ও ভোট চলাকালে নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা কমিশনের হাতে আছে। তবে নির্বাচনের ফলাফল গেজেট বা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি হবার পরে পুরো নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করা যাবে না। ভোট চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা আছে।

কমিশন আবশ্যিক মনে করলে ফলাফল গেজেট প্রকাশ করা স্থগিত রাখতে পারবে। নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ তদন্ত করতে পারবে। তদন্তের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সংগত মনে করলে যেসব কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেসব কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে গাইবান্ধায় একটি আসনে উপ-নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন অনিয়মের অভিযোগে সেদিনই ভোটগ্রহণ বাতিল করে নির্বাচন কমিশন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার তফসিল ঘোষণার সাথে সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য দায়িত্ব পালন করার বিষয়টিও উল্লেখ করেন। নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার যেকোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে কার্যকরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্বাচন অধিক পরিশুদ্ধ ও অর্থবহ হয়।”

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ ১৭টি রাজনৈতিক দল স্বাগত জানিয়েছে। অন্য দিকে, নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত বিএনপি সহ কয়েকটি দল তফসলকে প্রত্যাখান করে নির্বাচন না করার ঘোষনা দিয়েছে।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকার দৈনন্দিন রুটিন কাজ ছাড়া কোন উন্নয়নমূখী প্রকল্প নতুন করে অনুমোদন দিচ্ছে না। ফলে সংবিধান মোতাবক তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনে কোন বাধা নেই। আওয়ামীলীগসহ নির্বাচনমূখী দলসমূহ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

এহেন পরিস্থিতিতে বিএনপি কী করবে জানতে চাইলে রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, “আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করবো। সরকার আগের মতো নির্বাচন করতে পারবে না এবং সেটিই আমরা নিশ্চিত করবো।” কিন্তু কীভাবে সেটি হতে পারে তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দলটির নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিএনপি তাকিয়ে আছে পশ্চিমাদের দিকে। কিন্তু পশ্চিমারা সবকিছু নিজের মতো করে করাতে পারবে তার তো নিশ্চয়তা নেই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হিসেবে ভারতের ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্র্ণ।
ভারত সম্প্রতি দিল্লিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক বৈঠকে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গ তুলে এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে।

বিএনপির সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে, যথা ১) যে কোনভাবে হোক নির্বাচন ঠেকানো, এবং ২) তফসিল অনুযায়ী দ্রুত নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া। নির্বাচন ঠেকাতে হলে হরতাল-অবরোধসহ সহিংসতা করতে হবে। এর বিরুদ্ধে আবার যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির হুমকি আছে।

আবার শুধু হরতাল অবরোধ দিয়ে এমন কোন পরিস্থিতি বিএনপি তৈরি করতে পারেনি যাতে সরকার দাবি মানতে বাধ্য হয়। বিএনপি চাইছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করুক। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে নির্বাচন সংবিধানে থাকা নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। এক্ষেত্রে কোনও চাপ তারা গ্রহণ করতে রাজি নয়।

এমতাবস্থায় তফসিল অনুযায়ী দ্রুত নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়াই বিএনপির জন্য মঙ্গলজনক। বিএনপির যদি নির্বাচনের ব্যাপক প্রস্তুতি না থাকে, তবে নির্বাচনের তারিখ কিছুটা পরিবর্তনের আবেদন করতে পারে।

নির্বাচন কমিশন চাইলে চলমান সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের তারিখ বদলাতে পারে। যদি সেটি দরকার হয় তাহলে

নির্বাচন কমিশনের সে এখতিয়ার রয়েছে। সেক্ষেত্রে তফসিল সংশোধন করে দেয়া যায়। এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য তারিখগুলো পরিবর্তন করে দিতে পারে কমিশন। যেমন ২০০৮ সালে ড. এ টি এম শামসুল হুদার নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বরের ১৮ তারিখ নির্বাচনের তারিখ দিয়েছিলো। কিন্তু বিএনপি তখন নির্বাচনে আসবে কিনা সেনিয়ে নানা ধরনের আলোচনা চলছিল। এরপর বিএনপির দাবির ভিত্তিতে তাদের সাথে আলোচনার পর নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ২৯ ডিসেম্বর করা হয়েছিলো।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিএনপি এরূপ সুযোগ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তা বিএনপির জন্য মঙ্গলজনক হবে এবং নির্বাচনটিও অধিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে। অন্যথায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের সমন্বয়ে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ গঠিত হবে – এটি সন্দেহাতিতভাবেই বলা যায়।

লেখক: সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আশ্রয়ন প্রকল্প: দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামের দূর্দশা দেখে এই আশ্রয়হীন, ভূমিহীন ও অসহায় ছিন্নমূল মানুষদের পুনর্বাসনের সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশী ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর স্থবির হয়ে পড়ে দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের মতো জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো।

দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে পুনরায় শুরু করেন বঙ্গবন্ধুর সেই জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো। পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল মানুষকে মূলধারায় আনার জন্য বর্তমান

প্রধানমন্ত্রী সামনে নিয়ে আসেন “অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল” নামে বিভিন্ন কর্মসূচি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে ২০ মে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন পরিদর্শন শেষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন বঙ্গবন্ধুকন্যা এবং একই বছর বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি সারা দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে শুরু করেন “আশ্রয়ণ প্রকল্প”।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা- “বাংলাদেশের একজন মানুষও ভূমিহীন থকবে না, গৃহহীন থাকবে না, ঠিকানাবিহীন থাকবে না”। তিনি তার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কোমড় বেঁধে নেমেছেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ২৯ হাজার ৬০৭টি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে এবং পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৪১ লাখ ৪৮হাজার ৩৫ জন (আনুমানিক এক পরিবারে ৫ ব্যক্তি হিসাবে)।

শুধুমাত্র আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ পরিবার সরাসরি পুনর্বাসিত হয়েছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের বেশকিছু কর্মসূচির অধীনে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। শুধুমাত্র মুজিববর্ষেই এই প্রকল্পের আওতায় ২ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৫১টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে একক গৃহ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং পুনর্বাসিত জনসংখ্যা ১১ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৫৫ জন। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দেশের ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত জেলা ২১টি এবং উপজেলা ৩৩৪টি।

শুধু গৃহহীন-ভূমিহীন নয়, স¤পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী- হতদরিদ্র ভিক্ষুক, বিধবা, মান্তা, বেদে ও হিজড়া সম্প্রদায়, কুষ্ঠ রোগী, তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার, কয়লা খনির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (রাখাইন) পরিবার, হরিজন সম্প্রদায়, বাগদী সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী পরিবার, জলবায়ু উদ্বাস্তু মানুষকে ভূমি ব্যবহারের আওতায় এনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্বে এটি প্রথম ও সর্ববৃহৎ উদ্যোগ, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে তুলে আনার জন্য স¤পূর্ণ বিনামূল্যে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। একইসাথে পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ, সুপেয়

পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আধুনিক স্যানটিশেন, প্রার্থনাঘর, কবরস্থানসহ পুকুর খনন ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য রাস্তা নির্মাণ, যা এখনো চলমান। এককথায় এই আশ্রয়ণ প্রকল্প গৃহহীনদের মাঝে নিশ্চিন্তে দৈনন্দিন সকল কাজ শেষে একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ঘরের আঙ্গিনায় কৃষিকাজ করে নিজেদের শাক-সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন, মাছ-মাংসের চাহিদাসহ, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার প্রবল আগ্রহ ও সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিও চাঙ্গা হচ্ছে এবং একই সাথে দেশের অর্থনীতিতে বাড়তিমাত্রা যোগ করছে।
যেহেতু দেশের চরম দারিদ্র্যের আওতাভুক্ত জনগণই এই গৃহায়ন কর্মসূচির প্রধান উপকারভোগী, সেহেতু কমে আসছে হতদরিদ্রদের সংখ্যা, কমছে দারিদ্র্যের হার। অনেকের ধারণা, এই আশ্রয়ন প্রকল্পের কারণে দেশের চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে জনসংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ থেকে ৫ দশমিক ৮ এ নেমে এসেছে।

ইতোমধ্যে সারাবিশ্বে এই আশ্রয়ণ প্রকল্পৃ দারিদ্র্য বিমোচনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একদিকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার অপার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে এর মাধ্যমে সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে দক্ষ মানবস¤পদ উন্নয়ন, পরিবেশের উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকারের মতো বিষয়গুলোর মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অতীতেও ছোটোখাটো করে এদেশে এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। কখনই সফল তো হয়নি, বরং কখনো-কখনো দীর্ঘস্থায়ী সংকটের সৃষ্টি করেছে। জেনারেল জিয়ার সময় সমতলের মানুষদের পার্বত্য অঞ্চলে সেটেল করানোর যে ন্যক্কারজনক উদ্যোগ ছিল, তা থেকেই পরবর্তীতে পাহাড়ে অসন্তোষ আর শান্তি বাহিনীর সৃষ্টি। এখনও যে পাহাড় মাঝে-মধ্যে অশান্ত হয়ে ওঠে, তার জন্য যদি একজন ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয়, তার নাম জেনারেল জিয়া।

এমনকি টঙ্গীতে জেনারেল এরশাদ যে এরশাদ নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এখন সেখানে হারিকেন জ্বালিয়েও মূল বরাদ্দপ্রাপ্ত একজনের হদিস পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অথচ এসবের বিপরীতে ব্যপক সফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সূচিত আশ্রয়ণ প্রকল্পটি এবং এই সাফল্যের শতভাগ কৃতিত্ব একমাত্র তারই। কারণ, তিনি এই আশ্রয়ণ

প্রকল্পে তাঁর সুনিপন ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

গত ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস “আশ্রয়ণ: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল” নামে এই সৃজনশীল কর্মের মেধাস্বত্বের স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে-এক এলাকার মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা হয়নি, যা অতীতে প্রতিবারই করা হয়েছে। চরের মানুষকে পুনর্বাসন করা হয়েছে চর এলাকাতেই আর পাহাড়ের মানুষকে পাহাড়েই। এর উল্টোটি করা হয়নি কোনো ক্ষেত্রেই। ফলে, আশ্রয়ণ প্রকল্পে যারা ঠিকানা পেয়েছেন তারা সেখানেই থিতু হচ্ছেন, পুরনো ঠিকানায় ফিরে যাওয়ার কথা মাথায়ও আনছেন না।

আশ্রয়ন প্রকল্পের উপকারভোগী দু-একজনের অভিব্যক্তি টেনে আনা যেতেই পারে। ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার স্বপ্ননগর ও নগরকান্দার আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বদলে যাওয়া আশ্রয়হীন ছবেদা বেগম, লতিফা আক্তার, হাফিজুর রহমানসহ আরো অনেকেই বলেন “কিছু দিন আগেও ভাবিনী নিজের ভাল একটা বসবাসের ঠিকানা হবে, এখন সেটি হয়েছে, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারছি, নিজের হাঁস-মুরগি পালনসহ নানা কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, সত্যই এটা স্বপ্নের। এমনটি হবে ভাবিনি, সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার জন্য দোয়া করি। তিনি যেন আমাদের দিকে আরো তাকান। আমাদের জন্য আরো কিছু করে দেন”।

অন্যদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্পে কেউ কেউ বলেছেন, “বাবা-মা যা করেনি, শেখ হাসিনা তা করেছেন”। আবার অনেকে এও বলেছেন, “আমরা এতদিন জলে ছিলাম। পরের জায়গায় পলিথিন দিয়ে ঘর বানিয়ে থাকতাম। এতে আমাদের খুব কষ্ট হতো। এখন আমরা ঘর পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের ঘর দিয়েছেন। এখন আমাদের আর কষ্ট নেই। আমরা খুব খুশি। আমরা প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করি”।

সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত দেশের প্রথম হরিজন পল্লিতে ঘর পাওয়া সুনীল লাল বাঁশফোর বলেছিলেন “আমরা খুব কষ্টে ছিলাম। বাপ-মা খুব কষ্ট করছেন। ভালো বাড়ি ও জমি ছিল না। সবাই আমাদের কেমন চোখে দেখে। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের এমন উপহার দিলেন, যেন আমাদের নতুন জীবন দিলেন। এতো সুন্দর পাকা ঘরবাড়ি দিয়েছেন। আমরা খুব খুশি। শেখ হাসিনা আমাদের জীবনটা বদলায় দিয়েছেন”।

মনে করিয়ে দেয়-“আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও / রহিমুদ্দীর ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও। বাড়ি তো নয় পাখির বাসা-ভেন্না পাতার ছানি / একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি”। পল্লী কবি জসিম উদ্দিনের সেই আসমানীরা এখন নিজের ঠিকানা পেয়ে স্বাবলম্ভি হতে শুরু করছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়- এই প্রকল্পের মাধ্যমেই পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নবদিগন্ত সূচনা হয়েছে এই দেশের আকাশে।

এমনকি সারাবিশ্বেই এই আশ্রয়ণ প্রকল্প আজ দারিদ্র্য বিমোচনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অন্য দেশের কোন পরামর্শে নয়, এই উদ্যোগ বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। প্রত্যাশা থাকবে গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই মহতী ও মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে আগামীতেও এবং গৃহহীন মুক্ত হবে দেশের ৬৪ জেলা।

লেখক: প্রক্টর, সিলেট কৃষি বিশ^বিদ্যালয়, সিলেট।

ছিটমহলবাসীর মুক্তি ও কূটনৈতিক সাফল্য

“সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়”- সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের পররাষ্ট্রনীতিতে লিপিবদ্ধ এ অনুচ্ছেদকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণপূর্বক দেশের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা অত্যন্ত বিচক্ষনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এর আলোকে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক কূটনৈতিক সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের ঝুলি ভরা থাকলেও ছিটমহল সমস্যার সমাধানের সফলতা মানবিক কারনে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবে। ছিটমহল সম্পর্কে আমরা কমবেশি সবাই জানি। শব্দটির সূচনা মূলত ১৯৪৭ সালে সিরিল রেডক্লিফের মানচিত্র বিভাজন থেকেই। ছিটমহল বিনিময়

চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব, মর্মার্থ বুঝতে হলে এ সম্পর্কিত দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের জানতে হবে।

১৭৫৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর চলে ইংরেজদের দ্:◌ুশাসন-শোষণ। এসবের বিরূদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন, লড়াই-সংগ্রামের পর ভারতীয় উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য ১৯৪৭ সালের ১৫ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে “ইন্ডিয়ান্স ইন্ডিপেন্ডন্স অ্যাক্ট-১৯৪৭” পাস হয়। এ প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে নিযুক্ত শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের সময়ে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমারেখা নির্ধারণের পরিকল্পনা করেন। তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠন করেন এবং ব্রিটিশ আইনজীবী সিরিল রেডক্লিফকে এই কমিশনের প্রধান করেন।

এ প্রেক্ষিতে সিরিল রেডক্লিফ ১৯৪৭ সালের ৮ জুলাই লন্ডন থেকে ভারতে আসেন। তিনি মাত্র ৬ সপ্তাহ কাজ করে ১৩ আগস্ট সীমানা নির্ধারণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন এবং ১৬ আগস্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় সীমানার মানচিত্র। কিন্তু রেডক্লিফের অদূরদর্শীতা, কমিশনের সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা, স্থানীয় জমিদারদের লোভ এবং তৎকালীন কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভার খামখেয়ালিপনায় সীমানা নির্ধারণের কাজটি সঠিকভাবে করা হয়নি। ফলে এক দেশের ভূখন্ডে থেকে যায় আরেক দেশের জনগণ। সীমান্ত অঞ্চলে শুরু হয় “নিজভূমে পরবাসী” পরিচয়ে ছিটমহলবাসীর বসবাস।

ছিটমহল হচ্ছে মূলত এক দেশের ভিতর অন্য দেশের ভূখন্ড। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সর্বমোট ১৬২ টি ছিটমহল রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল ছিল ১১১ টি; ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল ৫১ টি যার মোট জমির পরিমান হচ্ছে যথাক্রমে ১৭,১৬০ ও ৭,১১০ একর। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ভারত-পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণের সময় অনাকাঙ্খিতভাবে সৃষ্ট উভয় দেশের মালিকানাধীন এই ছিটমহলগুলোকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে রাখা হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম সীমার বাইরে। ফলস্বরূপ মালিকানা সংক্রান্ত সংঘর্ষে ছিটমহলের মানুষদের তৈরি হয় পরিচয়- সংকট। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ। এক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আশ্রিত অন্য রাষ্ট্রের মালিকানাধীন নিরপরাধ জনগন কার্যত হয়ে পড়েন রাষ্ট্রহীন মানুষ!

২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের ভিতর ভারতের এবং ভারতের ভিতর বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোতে যথাক্রমে ৩৭,৩৩৪ এবং ১৪,২১৫ জন লোক

বাস করে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় অর্ধলক্ষাধিক ছিটমহলবাসির দৈনিক আয় ছিল মাত্র ১৭ টাকা। মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুপেয় পানি, বিদ্যুৎ, ভোটাধিকার, কর্মসংস্থান এর সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত ছিলেন তারা। ছিটের ছেলে-মেয়েরা যতই মেধাবী হোক না কেন, তারা আসল বাবা-মার পরিচয়ে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি কিংবা মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করতে পারত না। কারণ, উক্ত বিদ্যালয় বা পরীক্ষা-বোর্ডের দেশে পরীক্ষার্থী ও তাদের মা-বাবা ভিনদেশী। তাই ছিটের মেধাবি শিক্ষার্থীকে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে মিথ্যা পিতৃপরিচয় জোগাড় করতে হতো।

শুধু তাই নয়, সন্তানসম্ভবা বধূ নিকটতম হাসপাতালে গেলে ভর্তি নিত না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তঃসত্ত্বা বধূরা কি হাসপাতালে যেত না? অবশ্যই যেত। কিন্তু যাওয়ার সে পথ সুগম ছিল না। হাসপাতালে ভর্তি হতে দেশহীন দেশের গৃহবধূকে অপরিচিত কোন পর পুরুষের বউয়ের পরিচয়ে ভর্তি হতে হত। যে পুরুষ মানুষটি হাসপাতালের দেশের স্বীকৃত নাগরিক।

শিশুর জন্মের পর হাসপাতাল থেকে যে কার্ড দেওয়া হত, তাতে সদ্যোজাত শিশুটির বাবা হিসাবে সেই পুরুষটির নামই থাকত। সন্তানপ্রসবা নারীর স্বামীর পরিচয় কিংবা পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের পরিচয় মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বিক্রি হত। কোন মেয়েকে অপহরণকারীরা তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করলে, সে অভিযোগ নিকটতম পুলিশফাঁড়িতে নিত না। কারণ, দেশবিহীন ছিটের মেয়েকে ফাঁড়ির দেশ ঐ দেশের নাগরিক বলে মানত না। এমনকি, সীমান্তের প্রহরীদের কাছে নির্মমভাবে নির্যাতিত হওয়াও বাদ যায়নি ছিটমহলবাসীদের (৮ এপ্রিল ২০১৯, আনন্দবাজার পত্রিকা)। কতই আমানবিক, অভিশপ্ত ছিল তাদের জীবন যা ভাবলেই গা শিউরে উঠে।

প্রকৃতপক্ষে, ছিটমহলবাসী রাষ্ট্রের নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করত বিনা দোষে। তাদের ছোট্ট অসহায় জীবনের উপর যেকোন মুহূর্তে ধেয়ে আসত চরম বিপর্যয়। তাই নাগরিকত্ব ও পতাকা-প্রতীকহীন এই মানুষগুলির কত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, নিপীড়ন, মানবেতর জীবন- এসবকে নিত্যসঙ্গী করে ছিটমহলের জীবনপ্রবাহ বহমান ছিল দীর্ঘ ৬৮ বছর। এত কষ্টে ছিটমহলবাসী দীনাতিপাত করলেও তাদের নিয়ে কেউ ভাবেনি। সকলেই জমি চেয়েছিল, কিন্তু কেউ চায়নি এই অসহায় মানুষদের কষ্টের অবসান।

ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত কোন আইন পাশ হলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের অংশটুকু বাংলাদেশ ব্যবহারের অধিকার পেয়ে যাবে এবং পাশাপাশি ভারতও বাংলাদেশের অংশটুকু পেয়ে যাবে। এখানেই বাধে বিপত্তি। কারন ছিটমহল বিনিময় চুক্তি পাশ হলে বাংলাদেশ ভরতের চেয়ে প্রায় ১০,০০০ একর জমি বেশি পাবে। যদিও ছিটমহল বিনিময় চুক্তির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল ছিটমহলবাসীর নাগরিক পরিচয় ও স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু দু:খজনকভাবে জমির হিসাব এখানে মূখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ানোয় রাষ্ট্রপ্রধানরা সর্বদা চুপ থেকেছেন। কিন্তু চুপ থাকতে পারেননি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সুযোগ্য তনয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাই তো ১৯৭৪ সালে ভারত সফরকালীন বঙ্গবন্ধু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দুই দেশের বিরাজমান সীমান্ত সংকট নিয়ে কথা বলেন। সেখানে তিনি রেডক্লিফের কার্যক্রমকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছিটমহলবাসীদের দূর্বিষহ জীবন-চিত্র তুলে ধরেন।

১৯৭৪ সালের ১৬ মে দুজনের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ‘৭৪ এর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি’ নামে পরিচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় সংশোধনী জাতীয় সংসদে (২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪) বাংলাদেশ সরকার মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি পাশ করলেও ভারত সরকার পাশ করেনি। দূর্ভাগ্যবশত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দুই রাষ্ট্রের আর কোন সরকার প্রধানই ছিটমহল সমস্যা সমাধানে তেমন আন্তরিক ছিলেন না। তাই ‘৭৪ এর চুক্তির পর ছিটমহলবাসীর মনে যে কিঞ্চিৎ আশার আলো ফুটে উঠেছিল, অংকুরেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

মানবতার মা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর চুক্তিটি বাস্তবায়নের প্রতি জোর দেন। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের সাথে কয়েক দফায় আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ আবার ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় এ সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা শুরু করেন।

২০১১ সালের হাসিনা- মনমোহন প্রটোকল স্বাক্ষর তার স্পষ্ট প্রমাণ। সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার ২০১৩ সালে এ সংক্রান্ত একটি বিল সংসদে উত্থাপন করে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সংসদ সদস্যেদের বিরোধিতায় পাশ করা সম্ভব হয়নি তখন।

এরপরেও দমে যান নি অদম্য শেখ হাসিনা। অত্যন্ত বিচক্ষনতার সহিত ঠান্ডা মাথায় প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যে বিজেপির তীব্র

বিরোধিতার কারনে ২০১৩ সালে এ বিল পাশ হয়নি, সেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন মোদি ২০১৪ সালে ভারতে সরকার গঠন করলেও আশাহত হননি আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান। বরং দ্বিগুন উদ্যম নিয়ে দারুন কুটনৈতিক দক্ষতায় এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মোদিকে রাজি করান। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবি নেতৃত্বাধীন মোদি সরকার সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষে ৭ মে ২০১৫ সালে ভারতীয় সংসদের নিম্ন কক্ষ লোকসভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার স্থল সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত বিল ৩৩১-০ ভোটের ব্যবধানে সংবিধানের ১০০ তম সংশোধনীর মাধ্যমে পাশ হয়। এ চুক্তি কার্যকর হয় ৩১ জুলাই’ ২০১৫ সালের মধ্য রাত থেকে। এই চুক্তির মাহাত্ম বলে শেষ করা যাবে না। কেননা, এই চুক্তির মাধ্যমে ৩০২ বছর ধরে চলমান সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় এবং ছিটমহলে বসবাসকারী প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষ ফিরে পায় নাগরিকত্ব।

৬৮ বছরের বন্দীজীবনের অবসান হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন পিছনে ফেলে ফিরে পায় আলোকিত জীবন। চুক্তি পরবর্তী বাংলাদেশের অংশের ছিটমহলের মানুষের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিপুল অর্থ বরাদ্ধ দিয়ে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করেন। নির্মান করেন স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল। থাকার জন্য গৃহ নির্মান করে দেন। মোদ্দাকথা, মানবেতর ও বদ্ধ জীবন থেকে এই মানুষগুলিকে মুক্তি দিয়ে নাগরিক মর্যাদা প্রদানপূর্বক সকল অধিকার নিশ্চিতের এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন মমতাময়ী শেখ হাসিনা। তাঁর এ মহান উদ্যোগ সমহিমায় স্মরিত হবে যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। তাঁকে ছিটমহলবাসি কৃতজ্ঞতায় রাখবেন আজীবন।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগবরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা প্রসারে আওয়ামী লীগ

সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও অর্জন

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষের মেধা বিকশিত করার মাধ্যমে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। তাই দেশে দেশে শিক্ষা সচেতন মানুষ শিক্ষার অধিকার আদায়ে সক্রিয়। এই সত্যটি উপলব্ধি করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই শিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনে তিনি কার্যকরী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় শিক্ষায় পুঁজি বিনিয়োগ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা, দারিদ্র্যের কারণে মেধাবী শিক্ষর্থীরা যেন উচ্চশিক্ষা বিমুখ না হয় এরকম সুস্পষ্ট কিছু প্রস্তাব রেখেছিলেন।

পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পরই শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পাকিস্তানি ধারা পরিত্যাগ করে বাঙালি জাতির বিকাশের উপযোগী একটি সুস্থ ধারার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া একটি দেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন। এজন্য শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং যুগোপযোগী কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করার লক্ষ্যে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠন এবং এর মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন, মাদ্রাসা এডুকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭২ এবং প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট ১৯৭৪ নামে দুটি আইন প্রণয়ন করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি সব ক্ষেত্রেই আধুনিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালে উচ্চশিক্ষা প্রসারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন পেশা ও বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে দেশের চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারই প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে ৭% বরাদ্দ বেশি রেখেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা দিয়েই দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করে জাতিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালে ২য় বারের মতো ক্ষমতায় এসে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর নিমিত্তে আধুনিক সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের শিক্ষা কমিশনের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অভিন্ন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিশুদের মধ্যে গণতন্ত্র ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর তাগিদে ২০১০ সাল থেকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিলো। এর ফলে শিক্ষায় শিশুর অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার পর্যায়ক্রমে কমে ৪৭.২৫% থেকে ১৩.৯৫% এ নেমে আসে।

কোভিড-১৯ চলাকালীন পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় এনে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ধারবাহিকতা বজায় রেখেছেন। প্রায় প্রতিটি স্কুলে আইসিটি ল্যাব চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে কম্পিউটার কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনার লক্ষ্যে শিক্ষকদের আইসিটি ও পেডাগজি সমন্বয়ের প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

২১ শতকের নানবিধ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং সম্ভাবনার পূর্ণ সুফল গ্রহণের জন্য অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক এবং যোগ্য বিশ্ব-নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে ।

দেশব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দক্ষ ও সৃষ্টিশীল মানব শক্তি তৈরিতে সর্বশক্তি নিয়োগ, উচ্চশিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য হাইয়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহেনসমেন্ট প্রজেক্ট গ্রহণ, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন তাৎপর্যপূর্ণ

ভূমিকা রেখেছে। শুধু সাধরণ বা প্রযুক্তি শিক্ষা নয় শেখ হাসিনার সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা কাঠামোতে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করেছে। স্থাপিত হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। দাওরা হাদিসকে মাস্টার্স সমমান প্রদান করে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে বর্তমান সরকার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি কওমি মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থার সরকারি স্বীকৃতি কার্যকর করেছেন। অথচ ইতোপূর্বে কোনো সরকারকেই কওমি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তেমন গুরুত্ব দিতে দেখা যায়নি।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর পরিবারসহ নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর বিভিন্ন সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও শিক্ষা বিস্তারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি। অধিকন্তু তৎকালীন বিএনপি সরকার ১৯৮১ সালে সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বেসরকারিকরণ করার উদ্যোগ গ্রহন করে। যদিও শিক্ষকদের জোরদার আন্দোলনের ফলে বিএনপি সরকার তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। অন্যদিকে ২০০৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের আন্দোলনে অনেক শিক্ষককে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠানো হয়। কাজেই সবদিক বিবেচনায় একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের অগ্রযাত্রা, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসারে আওয়ামী লীগ সরকারের অবদান অনস্বীকার্য।

লেখক: চেয়ারম্যান, শিক্ষা বিভাগ ও ডিন, শিক্ষা বিজ্ঞান অনুষদ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রেসক্রিপশন নির্ভর বিএনপির রাজনীতি

‘তালগোল পাকানো’ শব্দটার প্রতিশব্দ হলো, মারাত্মক ভুল; মন্দভাবে পরিচালনা করা ইত্যাদি। এই ‘তালগোল পাকানো’ শব্দটা বর্তমান রাজনীতিতে সুনির্দিষ্ট করে বললে বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য। কীভাবে?

আপনি যদি রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বা রাজনীতি সচেতন মানুষ হন তবে গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন, বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতিতে প্রধান স্পোক পার্সন আসলে কে এটা খুঁজে পাওয়া যাব না। একেক সময় একেকজন আর্বিভূত হন। যখন কাউকে পাওয়া যায় না তখন অবতাররূপী কাউকে কাউকে দেখা যায়।

কে তাদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে বা কে তাদের রাজনৈতিক নির্দেশনা দিচ্ছে? এইরকম একজন নয়, অসংখ্য লোক পাবেন। কেন অসংখ্য? কারণ তারা আসলে সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে নিয়ে রাজনীতি করছে না। সময়ের সাথে সাথে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। একেক সময় তারা একেক ধরনের দফা-রফা নিয়ে মাঠে নামে। সহজ করে বললে, তাদের রাজনীতি হলো ‘প্রেসক্রিপশনের রাজনীতি’।

ডাক্তার যেমন রোগী দেখে বিভিন্ন ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখে দেন বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতিও বহুজনের প্রেসক্রিপশনে বা বহুজনের মতামতে বা বিদেশি নির্দেশ বা সুপারিশে চলছে।

বাংলায় দুইটি প্রবাদ বাক্য বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির জন্য প্রণিধানযোগ্য। ‘নানা মুনির নানা মত’ ও ‘অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট’। এই অধিক সন্ন্যাসীরা কখনো বলছেন সংলাপ প্রয়োজন, কখনো বলছেন সংলাপ প্রয়োজন নেই বা বিএনপি সংলাপে যাবে না।

এরা কখনো বাইডেনের প্রতিনিধি ধরে আনে, কখনো বৈদেশিক শক্তির ভয় দেখায়, কখনো নির্বাচন বয়কট করার ঘোষণা দেয়, কখনো সরকার পতনের ঘোষণা দেয়, কখনো আবার ১১ দফা বা ১ দফার ঘোষণা দেয়। এতসব ঘোষণা বা কর্মসূচির ভিড়ে তাদের আসল লক্ষ্য কী তাই বোঝা যাচ্ছে না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিএনপি-জামায়াতের কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডায় জনগণের চাহিদা গুরুত্ব পায়নি। জনগণ যখন পণ্যের উচ্চমূল্য নিয়ে প্রতিবাদ করছে তখন তাদের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই, নেই আন্দোলন, নেই বিক্ষোভ। তখনো তারা সরকার পতন নিয়ে ব্যস্ত। সরকার পতন অবশ্যই তাদের আন্দোলনে থাকবে কিন্তু তার সাথে সাথে জনগণের চাহিদা কেন তাদের মাথায় থাকবে না তা আমরা বুঝি না। এর মূল কারণ হলো, বিএনপি-জামায়াতের আন্দোলনের এই প্রেসক্রিপশন তাদের নিজেদের নয়। অন্য কোনো শক্তির বলে দেওয়া আন্দোলন বা এজেন্ডা। মূল কারণ হলো, ‘নানা মুনির নানা মত’ ও ‘অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট’।

একদিকে যেমন নেতৃত্ব শূন্যতা অপরদিকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাও বিভিন্নজনের ‘প্রেসক্রিপশন’ শুনে মূল বিষয় বলতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

যখন নিজেদের লক্ষ্য স্থির থাকে না তখন বাইরের কেউ এসে তার মতো করে লক্ষ্য স্থির করে দেয়। যেমন মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং দলের ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ‘বিএনপির ভোটে অংশ নেওয়া উচিত। বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিলে আমি এই দল থেকেই নির্বাচন করব।’ অথচ এই কথাটা বিএনপির বাকি নেতাদের মুখে নেই। তারা একেকসময় একেক কথা বলছেন। বিএনপির সামগ্রিক অস্থিরতা এখন দলের বিভাজন রেখা বড় করে দিয়েছে।

তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপার্সন শমসের মুবিন চৌধুরী বলেন, তৃণমূল বিএনপি দলীয় নিয়ম নীতি মেনে পরিচালিত হবে। প্রাইভেট কোম্পানি হবে না। তৃণমূল বিএনপি হবে বাংলাদেশের তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব। তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার বলেছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার আশ্বাস পেলে তারা নির্বাচনে অংশ নেবেন। ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবেন।

অনেকেই ধারণা করছেন, একাধিক রাজনৈতিক মতবাদের কারণে তাদের এই বিভাজন। আরও বিস্ময়কর হলো, ২৮ তারিখ থেকে হরতাল, অবরোধের কর্মসূচির ঘোষণা এসেছে বিএনপি থেকে। তাদের সিনিয়র নেতার এই কর্মসূচি দিয়েছেন। এখন দিচ্ছে গণতন্ত্রর মঞ্চ আর জামায়াত।

সরকারের পদত্যাগ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে আগামী ১২ ও ১৩ নভেম্বর সারা দেশে চতুর্থ দফায় (৪৮ ঘণ্টা) সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ।

রোববার (১২ নভেম্বর) ও সোমবার (১৩ নভেম্বর) আবারো টানা ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সরকারের পদত্যাগ, নির্বাচনকালীন কেয়ারটেকার সরকার গঠন, আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমানসহ সকল রাজবন্দি এবং ওলামা-মাশায়েখের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার দাবিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দলটি।

এরা কিন্তু একসাথে রাজনীতি করে, অথচ তারা একেক উদ্দেশ্য নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে অবরোধ ডাকছে। বিষয়টা কি এখন পরিষ্কার যে, যে দলের কাছে যে ধরনের প্রেসক্রিপশন আসছে তারা সেইভাবে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মসূচি দিচ্ছে।

তাদের জোটবদ্ধ হয়ে লক্ষ্যে ফিরতে হবে। ক্লোজআপ ওয়ানের সেই গানের মতো—যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবেই হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। বিএনপি-জামায়াতের উচিত বিভিন্নজনের প্রেসক্রিপশন বাদ দিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে রাজনীতি করা।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

লড়াই, সংগ্রাম, সাফল্য ও উন্নয়নের পথিকৃৎ শেখ হাসিনা

লড়াই, সংগ্রাম, সাফল্য ও উন্নয়নের নাম শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে গড়া দলটি যখন যোগ্য নেতৃত্বের সংকটে, ঠিক সেই সময় দলের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আবির্ভাব হয় শেখ হাসিনার। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত হওয়ার সাড়ে তিন মাসের মাথায় ওই সময়কার সরকারের রক্তচক্ষু ও নানা বাধা উপেক্ষা করে দীর্ঘ ৬ বছরের নির্বাসিত জীবন শেষ করে ১৭ মে দেশে ফেরেন তিনি।

বাবা-মায়ের স্নেহের যে বাড়িতে বড় হয়েছেন, সেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের সেই বাড়িতে, প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শেখ হাসিনার কণ্টকাকীর্ণ পথ চলা। শুরু করেন দেশের গণতন্ত্র এবং জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার নিশ্চিতের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের পথে তাকে পার হতে হয় নানা প্রতিবন্ধকতা। কারাবরণ করতে হয় একাধিকবার। অদ্যাবধি তাঁকে হত্যার জন্য ২০বার সশস্ত্র হামলা করা হয়। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বারবার মৃত্যুর মুখে পড়েছেন তিনি। তবুও পিছপা হননি, লড়াই সংগ্রাম ছেড়ে দেননি শেখ হাসিনা। শত বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন এবং হত্যার হুমকিসহ কোন কিছুই তাকে টলাতে পারেনি একবিন্দুও। বরং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে

গেছেন সামনের দিকে।

২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকারের মেয়াদ শেষ হলেও নানা রকমের টাল-বাহানা করে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নতুন ভোটার তালিকায় ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার ষড়যন্ত্রও করেছিল তারা। দলীয় রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকেই প্রধান উপদেষ্টার পদ দিয়ে হাস্যকর এক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ৬ জানুয়ারি নির্বাচনের নামে প্রহসন আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সচেতন দেশবাসী এসব অনিয়ম ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপকৌশলকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। সে সময় বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় সংকট ও অরাজক পরিস্থিতিতে সেনা সমর্থিত আরেক নতুন ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু তারাও নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করাসহ নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

বিলম্বে হলেও তারা পূর্বোক্ত ভোটার তালিকা সংশোধন ও ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির মাধ্যমে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। সেই ২০০৮ সালের নির্বাচনে “দিন বদলের সনদ”-রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন শিরোনামে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ভূমিধস বিজয় অর্জন করে।
এরপর ২০১৪ সালে “এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ” স্লোগানে সরকার গঠন করে ১০টি মেগা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালে “নিরাপদ ব-দ্বীপ” প্রণয়নের রূপরেখা প্রদান করে ২০১৮ সালে “সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ” শিরোনামে আবারও সরকার গঠন করে। ফলস্বরূপ আজ অবধি দেশের মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রেখেছে বলেই দেশের বিভিন্ন খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে ধারাবাহিক উন্নয়নের প্রতিফলন দৃশ্যমান হচ্ছে এবং দেশের মানুষ এর সুফল ভোগ করছে।

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শেখ হাসিনা সরকার বিভিন্ন মেগা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে চলেছে এবং যোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক ও রেলযোগাযোগ স্থাপনের জন্য পদ্মাসেতু, বঙ্গবন্ধু যমুনাসেতু, তিস্তাসেতু, পায়রাসেতু, দ্বিতীয় কাঁচপুরসেতু, দ্বিতীয় মেঘনা ও গোমতী সেতুসহ শত শত সেতু, সড়ক, মহাসড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ করেছে সরকার। এছাড়া ঢাকায় হানিফ ফ্লাইওভার, তেজগাঁও-মগবাজার-

মালিবাগ ফ্লাইওয়ার, কমলাপুর-শাহজাহানপুর ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামে আক্তারুজ্জামান চৌধুরী ফ্লাইওভার ও বদ্দারহাট ফ্লাইওভারসহ বহুসংখ্যক ছোট-বড় ফ্লাইওভার নির্মাণ করে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শেখ হাসিনার হাত ধরেই নতুন যুগে প্রবেশ করেছে, স্থান করে নিয়েছে স্যাটেলাইট বিশ্বে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মহাকাশে উৎক্ষেপন করেছে কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপনেরও প্রস্তুতি চলছে। গভীর সমুদ্রের তলদেশে অপটিক্যাল ফাইবার নির্মাণ এবং মহাকাশে স্যাটেলাইট স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা সহজতর হয়েছে।
দেশে বর্তমানে প্রায় ১৮ কোটির বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। একসময় দেশের টিভি চ্যানেল গুলো স্যাটেলাইট ভাড়া বাবদ বছরে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার ব্যয় করত। সে টাকা এখন থেকে দেশেই থেকে যাবে।
বাংলাদেশ বেতারসহ দেশের সবক’টি টেলিভিশন চ্যানেল এবং দেশের একমাত্র ডিটিএইচ অপারেটর ‘আকাশ’ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবা নিচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের ৩১টি দুর্গম ও প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চলের ১১২টি স্থানে টেলি যোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের অনেক স্বনামধন্য ব্যাংক, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সশস্ত্রবাহিনী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে তাদের সেবা দেওয়া শুরু করেছে। ফলে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু, উপজেলা শহরে ব্যাংকের এটিএম বুথ নির্মাণসহ সহজলভ্য ইন্টারনেট সেবা এখন মানুষের দোরগোড়ায়।

শুধু দেশি সংস্থা নয়, বাংলাদেশের পাশাপাশি বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল বর্তমানে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট থেকে ট্রান্সপন্ডার ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশ গুলো হচ্ছে হন্ডুরাস, তুরস্ক, ফিলিপাইন, ক্যামেরুন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সরকার প্রধান শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতেই এ সব কিছু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক মন্দা, করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সংকট সৃষ্টি করলেও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ‘সতর্ক’ অবস্থানে থেকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ‘কৃচ্ছতা’ অবলম্বনের মাধ্যমে সে সংকট এখন পর্যন্ত সফলভাবে মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করেছে।

দেশের অর্থনীতি এখনো বেগবান রয়েছে। ২০৩৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বিশ্বের ২০তম অবস্থান অর্জন করবে বলেও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অথচ বিএনপি-জামায়াতসহ একদল ষড়যন্ত্রকারী বাংলাদেশকে বরাবরের মতো পিছিয়ে নেবার যারপরনাই চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের বিরতিহীন অপতৎপরতা, সব ষড়যন্ত্রকারী এবং “নিন্দুকের মুখে ছাই” দিয়েই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে।
তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ এখন বিশ্বে একটি উন্নয়নের রোলমডেল। এর পুরোটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃতিত্ব। তার এই অনন্য কৃতিত্বে গর্বিত বাংলাদেশ, গর্বিত বাঙালি জাতি। দেশবাসীর উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়নকে উপলব্ধি করা এবং সে মতে কার্যক্রম গ্রহণ করা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন এলেই বিএনপিসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে আকৃষ্ট করতে অনেক প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দিয়ে থাকে। অতীতে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগ ছাড়া বিএনপি-জাতীয় পার্টি বা অন্যান্য দল যারা বৈধ-অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসেছে, তারা জনগণকে দেয়া অঙ্গীকারের ৩০ ভাগও বাস্তবায়ন করেনি। এমনকি প্রতিশ্রুতি পূরণে তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম একমাত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ, নির্বাচনের আগে যেসকল প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছে, তার শতভাগ পূরণ করার চেষ্টা করেছে এবং জনগণের আস্থা-বিশ্বাস আরও দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে।

সরকার প্রধান শেখ হাসিনাও চলমান মেয়াদে চতুর্থ বছর পূর্তিতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছেন, “এই ১৪ বছরে আমরা দেশ এবং দেশের জনগণকে কী দিতে পেরেছি- তার বিচার-বিশ্লেষণ আপনারা করবেন”। তিনি আরও বলেন, “রূপকল্প ২০২১-এর পর আমরা রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছি। রূপকল্প ২০২১-এ আমরা অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলাম। আজ সন্তুষ্টচিত্তে বলতে পারি, আমরা সে প্রতিশ্রুতি পূরণে সক্ষম হয়েছি”। আর এই বিশাল সফলতা ও বদলে দেয়া দেশের অর্জনগুলো সামনে রেখেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আগামী দ্বাদশ নির্বাচনে “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ”-এর প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে।

এরইমধ্যে প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে বিশদ বিবরণও দিয়েছেন। এ কথা আজ সর্বাংশে সত্য যে, শেখ হাসিনা তার সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব

দিয়ে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন।
বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে একমাত্র শেখ হাসিনাই পারবেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সুখী, সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়তে। এজন্য শেখ হাসিনার হাতকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। বিগত সময়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জন করছে, সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে আমাদের সকলের উচিত সরকারকে সকল কর্মকাণ্ডে সহায়তা ও আকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত রাখা।

লেখক: প্রক্টর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অপরাজনীতি

স্বাধীন বাংলাদেশে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অপরাজনীতির সূচনা হয়েছিলো ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের নৃশংসতম এই ঘটনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের দুই সদস্য শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করা হয়। পরিবার ও পরিবারের বাইরের সদস্য মিলে মোট আঠারো জনকে হত্যা করা হয় এই দিনে, প্রায় একই সময়ে।

হত্যাকাণ্ডের পরপরই খুনিচক্র ‘বাংলাদেশ বেতার’ দখল করে। নাম পাল্টে রাখে ‘রেডিও বাংলাদেশ’। আত্মস্বীকৃত খুনিদের অন্যতম মেজর ডালিম বেতার ভাষণে বলেন – “অদ্য সকাল হতে খন্দকার মোশতাক আহমেদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে। শেখ মুজিব ও তাঁর খুনি-দুর্নীতিবাজ সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে। এখন হইতে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হইলো। আপনারা সবাই আমাদের সহিত সহযোগিতা করুন। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন কোনো অসুবিধা আপনাদের হইবে না। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।”

বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক বেতার ভাষণে বলেন – “এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আজ দেশ এবং দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও দেশবাসীর উপর নির্ভর করে দেশের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নয়া সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

দেশের দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনী এই পদক্ষেপের সাফল্যের জন্য বীরের মতন এগিয়ে এসেছে।”

২৫ আগস্টে মেজর জেনারেল কেএম শফিউল্লাহকে অপসারণ করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সারাদেশে সামরিক বিধি জারি করে বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত গঠন করা হয়। মুখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বললেও দেশে চলে সামরিক শাসনের তুগলকি কাণ্ড। ৩০ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে এক সরকারি আদেশে সব রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই প্রথম রাজনীতি করার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় অপরাজনীতির ধারা। খন্দকার মোশতাক তার অবৈধ মন্ত্রিসভায় আরও অনেককে ভয়ভীতির মুখে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলেও চার জাতীয় নেতা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এইচএম কামরুজ্জামানকে বশে আনতে না পেরে কারাবন্দি করে।

এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ তারিখে জারি করা হয় কুখ্যাত ‘ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স’। অবৈধ রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের এই অধ্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের রক্ষা করা। অধ্যাদেশের প্রথম অংশে বলা হয় – ‘১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী যাহা কিছুই ঘটুক না কেন, এ ব্যপারে সুপ্রিম কোর্টসহ কোনো আদালতে মামলা, অভিযোগ দায়ের করা বা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া যাবে না।’ অধ্যাদেশের দ্বিতীয় অংশে বলা হয় – ‘রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে যাদের প্রত্যয়ন করবেন তাঁদের দায়মুক্তি দেয়া হলো।’

চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির চড়াই উতরাইয়ের উত্তাল সময়ের মধ্যে ০৩ নভম্বেরের শেষরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করে খুনির দল কারাগারে প্রবেশ করে এবং জাতীয় চার নেতাকে ব্রাশ ফায়ারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই রাতেই বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে খুনিচক্রকে ব্যাংকক পাঠিয়ে দেয়া হয়। খন্দকার মোশতাকের উপর বিদেশি প্রভু এবং দেশি ষড়যন্ত্রকারীদের ন্যস্ত দায়িত্ব ছিলো এই পর্যন্তই।
নীল নকশা অনুযায়ী ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ এ সামরিক আইনের বিধি সংশোধন করে সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের নিকট মোশতাক ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ওই দিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলেছিলেন, ‘… গত ১৫ আগস্ট কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিচ্যুত সামরিক অফিসার এক

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের হত্যা করে। খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সামরিক আইন জারি করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার সঙ্গে সামরিক বাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল না। দেশবাসী আশা করেছিল, দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরে আসবে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু আমরা সবাই নিরাশ হয়েছি। দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি সম্প্রতি কারাগারে অন্তরীণ কিছু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। …দেশে সামরিক আইন জারি রয়েছে। আমি একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় অন্তর্র্বতীকালীন সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবাধ নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এই দায়িত্ব ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, অথবা সম্ভব হলে তার পূর্বেই পালন করতে বদ্ধপরিকর।’

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখে জিয়াউর রহমান বন্দিদশা (খালেদ মোশাররফ কর্তৃক) থেকে কর্নেল তাহেরের আনুকূল্যে মুক্তিলাভ করেন। মুক্ত হয়েই জিয়া দ্রুত দেশি-বিদেশি শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করে কর্নেল তাহের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন এবং ক্ষমতার মূল কেন্দ্রের কর্তৃত্ব নিয়ে নেন। যে কারণে প্রেসিডেন্ট সায়েম জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া দ্বিতীয় ভাষণ দিতে বাধ্য হন। এ ভাষণে তিনি বলেন, ‘… পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য আমরা কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে দেশে সামরিক আইন প্রশাসন কাঠামো গঠন করা হয়েছে। এই কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হবেন। এতে তিনজন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকবেন। তাঁরা হচ্ছেন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান কমোডর মোশাররফ হোসেন খান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এমজি তাওয়াব।‘ প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করবেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দুজন রাষ্ট্রপতিই বেসামরিক হলেও তারাই হলেন প্রধান সামরিক শাসক!

৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫এ দালাল আইন বাতিল করে দেয়া হয়। এতে সমস্ত যুদ্ধাপরাধীদের কারাগার এবং অভিযোগ থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। শহীদদের রক্তস্নাত বাংলাদেশে বুক ফুলিয়ে চলতে শুরু করে রাজাকার, আলবদর, আল শামস্ বাহিনীর সদস্যরা। ৩ মে ১৯৭৬ তারিখে সরকারি এক

অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধানের ৩৮নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। যে কারণে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, পিডিপি, নেজামে ইসলামসহ অপরাপর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ আবার তাদের তৎপরতা শুরু করে। রাষ্ট্র-সমাজ আর রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয় যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত রাজাকার, আলবদর, আল শামস্ বাহিনীর সদস্যরা।

১৭ জুলাই ১৯৭৬ এ এক বিশেষ সামরিক আদালতে ‘সরকার উৎখাত ও সেনাবাহিনীকে বিনাশ করার চেষ্টা চালানোর’- অভিযোগে জাসদনেতা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড এবং এমএ জলিল, আ.স.ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, হাসানুল হক ইনু, তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খান সহ আরও অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেয়া হয়। ২১ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে আন্তর্জাতিক সকল আইনকানুন লঙ্ঘন করে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

২৮ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে বিচারপতি সায়েমের সামরিক সরকার রাজনৈতিক দলবিধি জারি করে। আওয়ামী লীগ তাদের সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন আহমদকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং মহিলাবিষয়ক সম্পাদিকা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে। খুনি খন্দকার মোশতাকের নবগঠিত ডেমোক্র্যাটিক লীগ এবং স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারি অনুমোদন পেলেও আওয়ামী লীগ নিয়ে টালবাহানা শুরু হয়। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত ‘বঙ্গবন্ধু’ শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত বিচারপতি সায়েমের সরকার ১৯৭৬ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে অনুমোদন দেয়। বিএনপির নেতৃবৃন্দ প্রায়ই বলে থাকেন, জেনারেল জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা এবং আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল করার অনুমতি দাতা। এ কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ, সে সময় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন বিচারপতি সায়েম।

১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর, সেনাপ্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদ গ্রহণ করেন। গ্রেফতার করা হয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিল, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাজেদা চৌধুরী, আবদুল মোমেন তালুকদার,

সালাউদ্দিন ইউসুফ, মোজাফফর হোসেন পল্টু, রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া এবং ন্যাপ নেতা মতিয়া চৌধুরীসহ আরও অনেককে।

লন্ডনের বিখ্যাত ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় বলা হয়, ‘প্রশাসন ক্ষেত্রে সায়েমের (প্রেসিডেন্ট) কোন ভূমিকা ছিল না এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শও করা হতো না। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করছিলেন এবং শাসনক্ষমতা থেকে সামরিক বাহিনীকে বিদায় দেয়ার জন্য তিনি ঘরোয়াভাবে শলা-পরামর্শ শুরু করেছিলেন। এখন তাঁকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হবে। সায়েমকে অসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে এতদিন রাখা হয়েছিল জিয়ার সামরিক শাসনের চেহারা ঢেকে রাখার জন্য।’

১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল বিচারপতি সায়েম পদত্যাগে বাধ্য হন এবং জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি হন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গে বিচারপতি সায়েম বলেন ‘যেহেতু জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছেন, এবং আমার মনে হয়েছে যে, উপদেষ্টা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই তাঁকে সমর্থন করেছেন, তাই আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করি যে তিনি নিজে কোন হুমকির সম্মুখীন না হয়ে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বাবলী সামলাতে পারবেন কি না’ তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। … প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে আমি জিয়াকে বলি, আমি যেহেতু নির্বাচন করে যেতে পারলাম না, তাই আপনার প্রতি অনুরোধ করবো নির্বাচন আয়োজনের। তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, তিনি নির্বাচন করবেন। শুনে আমি খুশি হই। কিন্তু আমি তখন বুঝতে পারিনি যে, নির্বাচনে তিনি নিজেই অংশ নেবেন। সেরকম ক্ষেত্রে সেনাপ্রধান থাকা অবস্থাতেই এবং সামরিক আইনের অধীনে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবেও, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন হয়েই তিনি নির্বাচন করবেন এবং সেই নির্বাচনে নিজে অংশগ্রহণ করবেন এমন চিন্তা তখন আমার মাথায় আসেনি।’

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং একই সঙ্গে সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল জিয়া জিয়াউর রহমান তার ওপর জনগণের আস্থা আছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য ৩০ মে ১৯৭৭ দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। সে সময় দেশে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫৬ জন। অবিশ্বাস্যভাবে সরকারি ঘোষণায় বলা হয় ৮৮.৫% ভোটার গণভোটে অংশ নিয়েছেন এবং জিয়াউর রহমানের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ সূচক ভোট পড়েছে ৯৮.৮৮%। এ নির্বাচন প্রসঙ্গে বিচারপতি সায়েম বলেন – “বস্তুত জিয়া তাঁর অবস্থান সংহত করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে একটা গণভোট করে ফেলেন। তাঁর প্রতি এবং তাঁর ঘোষিত

নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি ভোটারদের আস্থা আছে কি না তাই ছিল গণভোটের বিষয়। কিন্তু সেই গণভোটে হ্যাঁ বাক্সে এত বেশি ভোট পড়ে যে, জনগণ সেই ফলাফলকে হাস্যকরভাবে অবিশ্বাস্য মনে করে।” আওয়ামী লীগ এবং জাসদ ‘হ্যাঁ-না’ ভোট বর্জন করে।

১৯৭৮ সালের ৫ এপ্রিল জেনারেল জিয়ার সরকার বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে এক অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধীদের এবং বিদেশে পালিয়ে থাকা আলবদর-রাজাকারদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ২৮ এপ্রিল ১৯৭৮ জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার একটি নতুন অধ্যাদেশ জারি করে। এতে বলা হয়, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন এবং রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

বন্দুকের জোরে গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতার অপব্যবহারের এ ধরনের নজির সারা বিশ্বে বিরল। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে জিয়া নতুন রাজনৈতিক দল ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল’ সংক্ষেপে বিএনপি গঠন করেন। একই সঙ্গে দলের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেন। তখনো দেশে কোনো সাধারণ নির্বাচন হয়নি বা জিয়া সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেনি।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৮ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়া এক ফরমান জারি করে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে প্রেসিডেন্টের হাতে প্রায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর নির্বাচনী প্রচারের স্বল্প সুযোগ দিয়ে ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলসমূহ আপত্তি জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন এক ঘোষণায় ২৭ জানুয়ারির পরিবর্তে ১৮ ফেব্রূয়ারি ১৯৭৯ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুনঃতফসিল ঘোষণা করে।

সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ায় এবং নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেয়ায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু থেকেই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় থাকলেও সামরিক সরকারের মুখোশ উন্মোচন এবং আন্দোলনের অংশ হিসেবেই আওয়ামী লীগসহ অপরাপর রাজনৈতিক দলসমূহ এ নির্বাচনে অংশ নেয়। ক্ষমতাসীন জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন নবগঠিত বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করে।

অপরাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা পাকাপোক্ত করার পর ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিলে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই জারি করা হয় কুখ্যাত ‘ইনডেমনিটি এক্ট’ । এটি মোশতাকের ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সের চেয়ে আরও ভয়াবহ, আরও অনেক বেশি নির্মম। এই আইনে বলা হলো – “১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ ১) এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইলো, ২) ওই সকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ এতদ্বারা বৈধভাবে প্রণীত, কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল, এবং ৩) তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।“

এই আইনের অর্থ দাঁড়ালো এরকম – ‘৭৫ এর ১৫ আগস্টে সংঘটিত বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু রাসেল সহ ১৮ জনের হত্যা বৈধতা পেলো এবং বলে দেয়া হলো কোথাও এর কোনো বিচার চাওয়া যাবে না’ ১৯৭৫ এর ০৩ নভেম্বরে জাতীয় চার নেতার জেল হত্যা বৈধতা পেলো এবং বলে দেয়া হলো কোথাও এর কোনো বিচার চাওয়া যাবে না, ‘৭৫ এর ৩১ ডিসেম্বরে বাতিলকৃত দালাল আইন বাতিলই থাকবে, ফিরিয়ে আনা যাবে না, ১৯৭৬ সালের ০৩ মে এ সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার সুযোগ করে দেয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না, খুনিচক্রকে বিদেশে পাঠানো এবং বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না।

খালেদ মোশাররফ হত্যার বিচার, কর্নেল তাহের হত্যার বিচার, সেনা ক্যুতে নিহত হাজার হাজার সামরিক সদস্যদের বিচার বহির্ভূত হত্যার বিচার – কোনো কিছুর ব্যপারেই বিচার চাওয়াতো দূরের কথা, মামলা পর্যন্ত করা যাবে না, ‘৭৭ এর প্রহসনের হাঁ – না গণভোটকে বৈধতা দেয়া হলো’ সবচেয়ে বড় কথা – অসাংবিধানিক উপায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াকে বৈধতা দেয়া হলো! জিয়াউর রহমানের এই ইনডেমনিটি আইনের চেয়ে বড় ‘রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের’ উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতির বীজ বপন করা হয়েছিলো ১৯৭৯ সালের এই ইনডেমনিটি আইনের মাধ্যমেই – যার খেসারত আমরা আজও দিয়ে চলছি।

লেখক: উপ-উপাচার্য, বুয়েট।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হরতাল-অবরোধের ক্ষতি

গুজরাটি শব্দ ‘হর’ মানে সব জায়গায় আর ‘তাল’ মানে তালা। অর্থাৎ হরতাল মানে সব জায়গায় তালা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকবৃন্দের মতে হরতাল হচ্ছে – গাড়ির চাকা ঘুরবে না এবং অফিস-আদালতসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। এক কথায় সব কিছু অচল করে দেওয়ার কর্মসূচি হচ্ছে হরতাল।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হরতালের প্রবর্তন করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ‘তমুদ্দিন মজলিস’ প্রথম হরতাল ডাকার পর থেকে এ দেশের রাজনীতিতে হরতাল কর্মসূচিটি প্রচলিত হয়।

অন্যদিকে অবরোধ কর্মসূচি হচ্ছে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সবকিছু খোলা রেখে যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। গ্রিক উপাখ্যানে ইলিয়াড ও ওডেসিতে ট্রয় নগরী অবরোধের কথা আছে। ১১৮৭ সালে সালাউদ্দিন আইয়ুবি জেরুজালেম অবরোধ করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বিএনপি-জামাতসহ কয়েকটি বিরোধী দল হরতাল-অবরোধকে একই ধরণের কর্মসূচী বিবেচনা করে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড যুক্ত করে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে। তারা হরতাল ও অবরোধে অগ্নিসংযোগ করে জালাও-পোড়াও করছে এবং সব ধরনের সরবরাহ চেইন বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত করে জনদূর্ভোগ বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হরতাল ও অবরোধে ক্ষতির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

কৃষি উৎপাদন ব্যাহত: সরবরাহ চেইন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কৃষি উপকরণ যেমন সার, বালাইনাশক, বীজ, গ্রোথ রেগুলেটর, সেচ কাজের জন্য ডিজেল ইত্যাদি স্থানীয় বাজারে পৌছাতে পারছে না, ফলে কৃষক এগুলো সংগ্রহ করতে পারছে না। আবার কম সরবরাহের কারণে এগুলোর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য শহরের বাজারে পাঠাতে পারছে না। সার্বিকভাবে কৃষক

ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি: অবরোধের কারণে সব ধরনের সরবরাহ চেইন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গত কয়েকদিনে কৃষি পণ্য বাজারে আসতে পারছে না। ফলে কৃষি পণ্যসহ অন্যান্য যাবতীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ছে। হরতাল-অবরোধের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

দেশে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে আলু, পেঁয়াজ, চিনি, সয়াবিন তেল ও ডিমের দাম বেঁধে দেয়্। সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম বাজারে কার্যকর না হওয়ার পেছনে সরবরাহ ঘাটতিই দায়ী। সরবরাহ যদি ঠিক থাকত, তা হলে বাজারে নিত্যপণ্যের দাম কমে যেত। সরবরাহ সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম কার্যকর করা যাচ্ছে না।

শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত: হরতাল-অবরোধের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অচলাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। নভেম্বর মাসে বিদ্যালয়সমূহে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বার্ষিক পরীক্ষা আয়োজন করতে হিমসিম খাচ্ছে। অবরোধের সংগে জালাও-পোড়াও ও অগ্নি সংযোগের অপরাজনীতি যুক্ত হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্র, অভিবাবক সকলেই উদ্বিগ্ন। ঝুকি নিয়ে যাতায়াত করলেও তাদের যাতায়াত খরচ বহুগুনে বাড়ছে।

স্বল্প আয়ের মানুষের জীবিকা ব্যাহত: হরতাল-অবরোধে রিকসা-ভ্যান ও অটোরিকসা চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দিনমজুরগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অটোরিকসা চালককে মালিকের দৈনিক ভাড়া পরিশোধ করতে হচ্ছে, কিন্তু তারা পাচ্ছে না যাত্রী। শ্রমিকরা পাচ্ছে না কাজ। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা টিকে থাকতে পারছে না। সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওযায় তাদের ত্রাহিত্রাহি অবস্থা।

ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত: জনগণ ও অর্থনীতিকে জিম্মি করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার লক্ষ্যে সরকার-বিরোধী দলসমূহের ডাকা অবরোধের সংগে অগ্নি-সন্ত্রাসের ভয়ে ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকমতো চালাতে পারছে না। এভাবে চললে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের ঠিকমতো বেতন-ভাতা দিতে পারবে না। ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী ছাঁটাই করতে বাধ্য হবে। বেকারত্ব বাড়বে।

আমদানী-রপ্তানী হ্রাস: বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় এমনিতেই বিদেশী ক্রেতারা তাদের ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিচ্ছে। হরতাল-অবরোধের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে সময়মতো পণ্য বন্দরে পৌঁছে দেওয়ার

ক্ষেত্রে যেমন বাধা সৃষ্টি হবে, পাশাপাশি পণ্যের জাহাজীকরণও হবে বাধাগ্রস্ত। এ সুযোগে ক্রেতারা তাদের ক্রয়াদেশ আরও কমিয়ে দেবে। আগের দেওয়া ক্রয়াদেশ নিশ্চিত করতে দেরি করবে। রাজনৈতিক এসব কর্মসূচি কারও উপকার বয়ে আনে না।

কর্মসংস্থান হ্রাস: রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বিনিয়োগের টাকা ফেরত আসা, পণ্যের বাজারজাতকরণ, শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা, বিনিয়োগ ঝুকি, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তারা ভাবতে শুরু করছেন। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীগণ নতুন কর্মী নিয়োগের পরিবর্তে কর্মী ছাটাই করার কথা ভাবছে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান হবে না, বরং কর্মসংস্থান আরও কমবে। যার প্রভাবে বেড়ে যেতে পারে বেকারের সংখ্যা।

বিদেশী বিনিয়োগ হ্রাস: বিদেশীরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ দেখলে বিনিয়োগ করে না। হরতাল অবরোধ থাকলে পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিদেশী বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। ফলে, এখন দেশের অর্থনীতি অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে।

অর্থনীতিতে সংকট: হরতাল-অবরোধ, জ্বালাও-পোড়ায়ের কারণে দেশে অর্থনীতিতে সংকট আরও বাড়াবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গবেষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, দুই বছরের করোনা মহামারীর ধাক্কা কাটতে না কাটতেই পৌনে দুই বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এমনিতেই সংকটে আছে দেশের অর্থনীতি। ফের রাজনীতির মাঠ সহিংস হয়ে উঠলে দেশে অর্থনীতিতে সংকট প্রকট আকার ধারণ করবে।

বস্ত্র শিল্পের সংকট: দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্প। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ, ইত্যাদি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে বস্ত্র ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা কমছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে দেশের ভেতরে অবরোধের অস্থিরতা সৃষ্টি হলে রপ্তানিমুখী শিল্প খুবই সংকটে পড়বে। অস্থিরতার কারণে ক্রেতারা বিকল্প খুঁজবেন। এ ধরণের অচলাবস্থায় বস্ত্র শিল্প সংকটে পড়বে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইসিটিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় জানিয়েছেন ২৮ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সহযোগীদের ৬ দিনের অবরোধ-হরতালে

অর্থনীতির আনুমানিক ক্ষতি হয়েছে ৩ দশমিক ৫ বিলিয়নের ডলারের বেশি।

বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। সে হিসেবে এক দিনের হরতাল বা অবরোধে দেশের ক্ষতি হয় প্রায় ১৪ হাজার কোটি ডলার। দেশের অর্থণীতি সচল রাখতে হরতাল-অবরোধের মত কর্মসূচী পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

লেখক: অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শর্তহীন সংলাপের প্রস্তাবে কেন ভিসানীতির হুমকি?

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করার পর আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে শর্তহীন আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। পাশাপাশি যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করবে তাদের বিরুদ্ধে পূর্বঘোষিত মার্কিন ভিসানীতি (থ্রিসি) কার্যকর হবে বলে হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

সোমবার ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র স্টিফেন ইবেলি এক বিবৃতিতে জানান, ‘যুক্তরাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাংলাদেশে একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায়। আমরা সব পক্ষকে সহিংসতা পরিহার এবং সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাই। যুক্তরাষ্ট্র কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না।’বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতির বিষয়টি মনে করিয়ে বলা হয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করবে তাদের বিরুদ্ধে পূর্বঘোষিত মার্কিন ভিসানীতি (থ্রিসি) কার্যকর হবে।

এরআগে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত। গত শনিবার ভারত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়, যা আমেরিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা জানিয়ে দেন, মার্কিন প্রশাসনকে তাঁরা বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অভিমত জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘ভারত মনে করে বাংলাদেশের নির্বাচন সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অন্য কোনও দেশের সেখানে হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।’ শুধু সংবিধান ও আইন অনুযায়ীই বাংলাদেশে নির্বাচন চায় চীন। আর ওই নির্বাচন নিয়ে বাইরের কারো হস্তক্ষেপ চায় না দেশটি। চীন নিজেও অন্য দেশে হস্তক্ষেপ করে না। ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। এমনকি বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু রাশিয়াও বাইরের হস্তক্ষেপের চায় না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

এর আগেও দলগুলোর মধ্যে শর্তহীন সংলাপের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। জবাবে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়ে দেন, বিএনপি সন্ত্রাসী দল। তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, ‘জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প কি কথা বলেন, মুখোমুখি বসে বৈঠক করেন? ওঁরা যেদিন করবেন, সেদিন আমি করব।’একই ভাবে সোমবার খুলনায় আওয়ামী লীগের জনসভায় শেখ হাসিনা জানিয়ে দেন, ‘বিএনপি মুন্ডুহীন দল। তাদের এক নেতা পলাতক আসামি, এক নেতা কারাগারের আসামি। সেই দল দেশে নির্বাচন হতে দিতে চায় না। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, কেউ যদি গাড়িতে আগুন দিয়ে পোড়াতে চেষ্টা করে, ওই হাত ওই আগুনে পুড়িয়ে দেবেন, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবেন, যেন আর কেউ সাহস না পায় দেশের মানুষের ক্ষতি করতে।’

প্রধানমন্ত্রীর কথায় পরিস্কার বিএনপির সাথে কোনো সংলাপে বসবে না আওয়ামী লীগ। যদিও এই প্রধানমন্ত্রী বিএনপির বিষয়ে অনেকটা নমনীয় ছিল। দাবি আদায়ে বিএনপি যদি কার্যালয় ঘেরাও করতে চায়, তাহলে তাদের চা খাওয়ানোর কথা জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যদিও প্রধানমন্ত্রীর এই আমন্ত্রণ নিয়ে তাচ্ছিল্য করেছিল বিএনপি। দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছিলেন, ‘চা খাওয়ার আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নেওয়ার কথা বলুন।’

বিএনপি বরাবরই বলে আসছে, শেখ হাসিনা সরকারের অধীনে তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে অবিচল দলটি। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের কথা বললেও বিএনপি তার আগে একটি শর্ত জুড়ে দিয়ে এসেছে। স্বভাবতই এখন প্রশ্ন উঠেছে- এতো দিন যে দলটি শর্তহীন সংলাপ বসতে চায়নি, সেই দলটি লুর কথায় সংলাপে বসবে? সংলাপে বসা ছাড়া বিএনপির

সামনে সত্যিই কী আর কোনো পথ খোলা আছে? বিএনপি সংলাপ চাইলেও আওয়ামী লীগ কি তাদের সাথে সংলাপে বসতে রাজি হবে? সংলাপে বসে হবে টা কী? তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র কেন সংলাপের কথা বলছেন? বাংলাদেশ নিয়ে তাদের এতো আগ্রহ কেন? কেনই বা তারা সংলাপের আহবান জানানোর পাশাপাশি ভিসানীতির হুমকি দিয়েছে?

যে দলটির জন্য যুক্তরাষ্ট্র শর্তহীন সংলাপের আহবান জানিয়েছে, সেই দলটি কখনই সুস্থ রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাসী ছিলোনা। ফলে আজ পর্যন্ত কোনো সংলাপেই সফলতা আসেনি। যখনই সংলাপের কথা এসেছে, তখনই হয় সংলাপ বর্জন করেছে অথবা শর্ত জুড়ে দিয়ে তা বানচাল করে দিয়েছে তারা। এবারের মতো ২০১৪ তেও সংলাপে অংশ নেয়নি, আর ২০০৭ ও ২০১৮ তে সংলাপে বসলেও শর্ত জুড়ে দিয়ে ও মিথ্যাচার করে সংলাপগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছ। এছাড়া নির্বাচন কমিশন যত বারই আলোচনার জন্য বিএনপিকে ডেকেছে, তারা যোগদান করেনি। গত বছরেও একই কাজ করেছে দলটি। যদিও তাদের প্রভুর আহবানে ‘আত্মগোপনে’ থাকা দলটি সংলাপে বসতে পারে। কিন্তু বিএনপি আলোচনা বসতে চাইলে যে সংলাপ হবে এমনটি নয়। কারণ সংলাপের ট্রেন হাতছাড়া করেছে বিএনপি। কারণ আওয়ামী লীগ শর্তহীন সংলাপের কথা এতো দিন বলে এসেছিল। সেই আহবানকে কোনো পাত্তাই দেয়নি বিএনপি। এখন আওয়ামী লীগ কী তাদের সাথে সংলাপে বসবে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন ‘খুনি দলের সাথে কিসের সংলাপ।’ কিন্তু রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে কোনো কাজ করানো যায়না। তবে ভালোবাসায় তাকে জয় করা সম্ভব। এমন উদাহরণ ভুরিভুরি আছে। খালেদা জিয়াকে মুক্তির জন্য টানা আন্দোলন করেছিল বিএনপি। তবুও প্রধানমন্ত্রীকে এক চুলও নড়াতে পারেনি তারা। অথচ খালেদা জিয়ার ভাই শামিম ইস্কান্দারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কারাগারের পরিবর্তে বেগম জিয়াকে বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকার উৎখাতের হুমকি দিয়ে যাকে টলানো যায়নি অথচ তিনিই মানবতার জন্য আবেদনে সাড়া দিয়েছেন।

এই খালেদা জিয়া কিন্তু শেখ হাসিনার মুখের সামনে তার বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অথচ ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুর পর খালেদা জিয়াকে শান্তনা দিতে ওই বাসায় গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। খালেদার বড় ছেলের পরিকল্পনায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছিল, জিয়াউর রহমানের মদদে ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল। তবুও বয়স্ক খালেদা জিয়ার প্রতি সহানুভুতি দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেমন কঠিন, তেমনি

মহানুভবও। তাই ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবেসে খুব সহজে তাকে জয় করা সম্ভব।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।